বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ : প্রসঙ্গ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

মো. আজিম উদ্দিন*

[সারসংক্ষেপ : মানুষের জীবনযাত্রার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত অথবা আলোড়িত নয়। বিশ্বায়ন মানবীয় সমস্ত বিষয়কে প্রভাবিত করতে পেরেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থাৎ এমন একটি বিষয়ও নেই যে বিষয়টি বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার শোষণের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সুগভীর প্রভাব লক্ষণীয়। বিশ্বায়নের পথ ধরেই বাংলাদেশে একে একে প্রবেশ করছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নানা উপাদান-অনুষঙ্গ আর অপ্রতিভ করে তুলছে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পথ ধরে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ কীভাবে বাঙালি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস থাকবে বর্তমান প্রবন্ধে।]

বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। সাম্প্রতিককালের এক প্রবল ও বহুল উচ্চারিত শব্দ হলো বিশ্বায়ন। এর নির্মাতা ও প্রবক্তাদের প্রচারগুণে এটা একালের এক নির্দোষ, নির্বিরোধী ও সর্বকল্যাণকর বিশ্ববিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বায়নের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্বায়ন উপহার দিয়েছে এক নতুন সভ্যতা যা পৃথিবী নামক গ্রহে এনে দিয়েছে এক প্রগাঢ় গুণগত পরিবর্তন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন (১৯২৭-২০০৮) যাকে মন্তব্য করেছেন 'সভ্যতার সংঘাত' (The Clash of Civilizations) হিসেবে, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন 'ইতিহাসের সমাপ্তি' (The End of History) বলে, আবার করবিন একে ইঙ্গিত করেছেন 'মধ্যযুগের প্রত্যাবর্তন' বলে। বিগত দুই দশক ধরে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি বিশ্ব সমাজের অন্তর্গত ধনী-দরিদ্র, সুবিধাভোগী-সুবিধাহীন সব শ্রেণির মানুষকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে চলেছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অর্থনীতি ও অর্থনীতি বহির্ভূত নানাবিধ স্বার্থ ও সম্পর্কের ঐক্য, সর্বজনীনতা ও সমরূপতা ইত্যাদি নির্দেশ করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ। যেখানে বিশ্বায়নের ধারণাটি লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নে সংস্কৃতির প্রবাহ যেন একমুখী, সর্বজনীন এবং অভিন্ন। এতে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যহীনতা একক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এর পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। বিশ্বায়নের কেন্দ্রে যারা অবস্থান করে তাদের সংস্কৃতি সর্বদাই আধিপত্য বিস্তার করে সম্মতি, আপস অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। বিশ্বায়নের ফলে ক্রমবিকাশমান তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আজ সর্বত্র বিরাজমান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তরুণ সমাজ আজ নৈতিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি হুমকির সম্মুখীন– যা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার দুটি উদ্দেশ্য : ১. বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও সংজ্ঞার্থ নিরূপণ এবং ২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রভাব ও স্বরূপ অনুসন্ধান। গবেষণাকর্মে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Narrative Manner) অনুসৃত হয়েছে। গবেষণাটি মূলত দ্বৈতীয়িক উৎস নির্ভর। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে– বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা, প্রতিবেদন, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, অনলাইন ওয়েবসাইট প্রভৃতি।

বিশ্বায়ন

'বিশ্বায়ন' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Globalization' এবং আরবি প্রতিশব্দ 'আল-আওলামাহ'। এর অর্থ কোনো বিষয়কে ব্যাপক করা এবং তার সীমারেখা বিস্তৃত করা। Webster's New Collegiate Dictionary-তে 'Globalization' এর অর্থ এভাবে দেওয়া আছে– কোনো বিষয়কে আন্তর্জাতিকতার পোশাক পরানো, কোনো বস্তুর সীমারেখা আন্তর্জাতিক বানানো। ফরাসি ভাষায় এটিকে 'Mondialization' বলে, যার অর্থ কোন বস্তুকে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে বানানো (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ৪৯ ও ৬০)। বিশ্বায়ন এক জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়ার নাম। বিশ্বায়ন প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিক ভিত্তিতে অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সাথে একীভূত করার প্রক্রিয়া। বহুমুখী এ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক ও কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রাবলি। ফলে প্রচলিত এ শব্দটিকে অবশ্য বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোল্যান্ড রবার্টসনই (Roland Robertson) 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির প্রবর্তক। তিনিই প্রথম একে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন ও সংজ্ঞায়িত করেন। রবার্টসনের মতে– "একটি ধারণা হিসেবে বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বিশ্বের সংকুচীকরণ বোঝায়, অপরদিকে তেমনি বিশ্বে একত্রীকরণের ধারণারও সৃজন করে" (উদ্ধৃত : রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, ২০১৫ : ১২৩)।

নোয়াম চমস্কি বিশ্বায়নের একটি ইতিবাচক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে : "বিশ্বায়ন হল একটি আন্তর্জাতিক সংহতিকরণ প্রক্রিয়া" (উদ্ধৃত : প্রাণগোবিন্দ দাশ, ২০১৩ : ২১৭)। পল হাস্ট ও গ্রাহাম থমসন তাঁদের *'Globalisation in Questions'* নামক বইটিতে বিশ্বায়নকে বর্ণনা করেন এভাবে :

> Globalisation has become a fashionable concept in the social sciences, a core dictum in the prescriptions of management gurus, and a catch phrase for journalist and politicians of every stripe. (উদ্ধৃত : মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ৪)

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা WTO তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংজ্ঞাটি লক্ষ করা যাক–

> বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল দেশের মাঝে সেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার নাম, যা প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস (পণ্য ও সেবা)-এর বিনিময় বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে সে সকল দেশের পুঁজি ও মূলধনেও প্রবৃদ্ধি হয়। সেই সাথে বিশ্বের প্রতিটি কোণে অতিদ্রুত টেকনোলজির বিকাশ হয়। এটি এমনিই এক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য কাস্টম ও ভৌগোলিক সীমারেখা তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক ও অভিন্ন বাজারে পরিণত করা। (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ৬২)

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো (১৯২৬-২০১৬) বলেন :

> বিশ্বায়ন হলো এক বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা যেটি ধারণ করে আছে এই সত্যটিকে যে আমরা সকলে একই জাহাজের যাত্রী, অর্থাৎ, একই গ্রহ যেখানে আমরা সকলে বাস করি। কিন্তু এই জাহাজের যাত্রীরা ভ্রমণ করছেন অত্যন্ত অসামঞ্জস্য অবস্থায়। সামান্য সংখ্যালঘুরা ভ্রমণ করছেন ইন্টারনেট, সেলুলার ফোন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সংবলিত বিলাসবহুল ক্যাবিনগুলিতে। তারা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ পুষ্টিসমৃদ্ধ, অঢেল এবং ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য উপভোগ করে থাকেন। তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা এবং সাংস্কৃতিক অভিগম্যতা। ভারাবনত ও ব্যথিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভ্রমণ করছেন এমন সব অবস্থায় যেগুলি আমাদের ঔপনিবেশিক অতীতে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় ভয়ঙ্কর দাস ব্যবসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই জাহাজের যাত্রীদের ৮৫ শতাংশ এরই নোংরা খোলের ভিতর ঠাসাঠাসি করে রয়েছে ক্ষুধা, রোগ-শোক এবং অসহায়ত্বের দুর্গতির মধ্যে। পরিষ্কারভাবে, ভাসমান থাকার পক্ষে এই জাহাজ খুব বেশি পরিমাণ অবিচারে পূর্ণ এবং এটি এমন অযৌক্তিক ও নির্বোধ পথে নিজেকে চালিত করছে যে কোন নিরাপদ বন্দরেই এর পক্ষে ভিড়া সম্ভব নয়। (হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ২০১৩ : ১৬৭)

বিশ্বায়নকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। কেননা বিশ্বায়ন নানা অর্থে নানা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। মূলত, বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষকে একই ছাতার নিচে সমবেত করার একটি প্রক্রিয়া। এর ফলে বিভিন্ন দেশের পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ সংঘঠিত হয়। বিশ্বায়ন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আদান-প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। একটি সুসংহত বিশ্ব অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্বায়ন বদ্ধ পরিকর। বিশ্বায়নের ফলে তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে সমগ্র বিশ্বের মানুষ একে অপরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করে। বিশ্বায়ন মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে।

বিশ্বায়ন : উদ্ভব ও বিকাশ

যদিও 'বিশ্ব' এই শব্দটি বহু প্রাচীন তবু এর থেকে উদ্ভূত 'বিশ্বায়ন' বা 'বিশ্বীকরণ' ইত্যাদি ধারণাগুলির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬০ সাল নাগাদ (রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী, ২০১৫ : ১২৩)। গত শতাব্দীর ৬০'র দশকের শেষের দিকে 'ক্লাব অব রোম' অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে পাশ্চাত্য মডেলের সীমাহীন প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা ঘোষণা করে সেখান থেকেই মূলত বিশ্বায়ন কথাটির উদ্ভব (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২২৯)। বিশ্বায়নের প্রবর্তক পুঁজিবাদী বিশ্ব। গত শতাব্দীর ৯০'র দশকে এই রীতি সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'Global' থেকে 'Globalization' এর উৎপত্তি। 'বিবিসি' এবং 'ভয়েস অব আমেরিকা' বিশ্বায়নের ধারণা বিস্তার করে। বিশ্বায়ন এভাবে নামহীন, পরিচয়হীন হয়ে যাত্রা শুরু করলেও ১৯৭০'র দশকে তা পূর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার লীলাভূমিতে পরিণত হয়। রিচার্ড কিলমিস্টিরের মতে, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় ১৯৬২ সালে ওয়েবস্টার ডিকশনারির সংস্করণে। তবে 'বিশ্বায়ন' প্রত্যয়টি ১৯৬২ সালে ওয়েবস্টার অভিধানে সংযোজিত হলেও তা মূলত অর্থনীতির আবরণে বিকাশ লাভ করতে থাকে ১৯৮৫ সালের দিকে। অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে বিশ্বায়নকে প্রথম ব্যবহার করেন থিওডোর লেভিট তাঁর '*The Globalisation of Markets*' বইটিতে ১৯৮৫ সালে। এ বইটিতে বিশ্বায়ন বলতে একটি সীমানাবিহীন ও অভিন্ন বৈশ্বিক অর্থনীতির কথা বোঝানো হয়। পরবর্তীতে OECD এর '*The Myths of Globalisation*' প্রকাশিত হওয়ার পর এটি একটি হটকেকে পরিণত হয় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স হিসেবে পরিগণিত (মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ৩-৪)। এককথায় বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিস্থিতি বিশ্বায়নের অনুকূলে যাওয়ায় এর আবির্ভাব ঘটেছে। পুঁজিবাদ ও উদারনীতিবাদের পরিবর্তিত রূপ দেখল যে সর্বত্র সংস্কার জয়ী হচ্ছে এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছে। সুতরাং তাকেও অতীতের খোলস ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। বিশ্বায়নকে উদারনীতিবাদ, পুঁজিবাদ ও বিকাশের মিলনক্ষেত্র বলা যেতে পারে (প্রাণগোবিন্দ দাশ, ২০১৩ : ২১৭)।

বর্তমান বিশ্বায়ন বিকশিত হয় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কারবাদী নেতা মিখাইল গর্বাচেভের 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রইকা' নীতি থেকে। সেখানে গর্বাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থার পুনঃসংস্করণ, উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সবার জন্য শান্তি, বৃহৎ শক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি। গর্বাচেভের এ নীতি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকিয়ে রাখা। যদিও সফল হয়নি বরং হিতে বিপরীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিনিয়র জর্জ ডব্লিউ বুশ (১৯২৪-২০১৮) 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির বহু প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেন (শাহ মোঃ আব্দুল হাই, ২০১৮ : ১৪৮)। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের দ্রুতগতিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য GATT বিলুপ্তির মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে WTO-এর চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৪ সালের WTO-এর চুক্তি বাস্তবায়নের পরে ১৯৯৫ সালে WTO (World Trade Organization) নামে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বা 'প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ববাজার গড়ে তোলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৫-২০০৪ সাল এ ১০ বছর সময়কে 'বিশ্বায়নের দশক' বলা হয়। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই মূলত বিশ্বায়নের সূচনা করে এবং বিকশিত করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে WB, IMF এবং WTO প্রভৃতি সংস্থাগুলো বিশ্বায়নের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে উন্নত দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কাজ করে চলেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২২৯)। বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বিকাশ বিশ্বব্যবস্থায় সূচনা করেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

বিশ্বায়নের চরম ও পরম অবস্থান আজ বিশ্বের সকল দেশের জন্য এক কঠিন সত্য। বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান পর্যায়ের সাথে যুক্ত হয় ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। উক্ত দশকে বাংলাদেশ ক্রমশ পরিণত হয়েছে বিশ্বায়নের বর্তমান অভিভাবকদের অবাধ 'পলিসি এক্সপেরিমেন্ট' এর লীলাভূমিতে। এরশাদের সামরিক শাসনকালে (১৯৮২-১৯৯০) বাংলাদেশ পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে যার মূল বিষয় ছিল– প্রথমত, বিরাষ্ট্রীয়করণ, অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ক্রমাগত সংকুচিত করা এবং বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা; দ্বিতীয়ত, উদারীকরণ, যার মাধ্যমে বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া; তৃতীয়ত, সরকারি আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান– যার মূল দিকগুলো ছিল ভর্তুকি প্রত্যাহার, উন্নয়ন ব্যয় কমানো এবং সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন করা। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের গড় আমদানি শুল্ক ছিল ৫৭.৩ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সালে সেই আমদানি শুল্ক হার কমিয়ে ৩৬ শতাংশ করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের বাজার বিশ্বের জন্য রাতারাতি উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় শিল্পগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, ফলে বিপুল সংখ্যক শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায় (বাংলাদেশ স্টাডিজ : ২১৯)। বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। বিশ্বায়ন বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ সবকিছুতেই বিশ্বায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় দেশীয় সংস্কৃতিতে দেখে দিয়েছে মারাত্মক আগ্রাসন। এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে খুব কঠিন।

সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানে বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি ধারণা। সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ একটি উপাদান। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতি হলো মানুষের একক বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে মানুষ জীবজগতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে। ইংরেজি 'Culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো নিরন্তর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানব গুণ। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদির মার্জিত রূপকেই সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, সংস্কৃতি হলো অশিক্ষা, অশিষ্টতা ও রুক্ষতা ইত্যাদির বিপরীত বিষয়। সাধারণত, সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের সুশিক্ষা, সুনীতি, সুআচার, সুরুচি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য, যে-সব ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। বস্তুত, মানুষ যখন স্থূল ও অপক্ব ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে মার্জিত হতে পারে তখনই কেবল সে সংস্কৃতিবান হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় (রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ২০০৫ : ১৬৩-১৬৪)। প্রখ্যাত বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী টেইলর তাঁর *'Primitive Culture'* গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

> Culture is that complex-whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ২০০২ : ৪৫-৪৬)।

নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কি বলেন : "Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his end" (উদ্ধৃত : মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান, ২০১৭ : ১৫১-১৫২)। জোন্স তাঁর *'Basic Principles of Sociology'* গ্রন্থে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : "Culture is the sum of man's creations" (উদ্ধৃত : মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান, ২০১৭ : ১৫১-১৫২)।

এককথায়, সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনযাপন প্রণালী। এটি বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং সমাজ ও সভ্যতার মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বাঙালি সমাজের নানা উপাদান যেমন– খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও ভাষাব্যবহার, পোশাক, ধর্মীয় আচার মান্য করার রীতি, পারস্পরিক ব্যবহারের রীতি, নীতি ও মূল্যবোধ, আনন্দ-বেদনা-উদ্‌যাপন-এর প্রকাশ, উৎসব ও আচারাদি, খেলাধুলা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরম্পরায় অর্জিত কীর্তি প্রভৃতি। যেহেতু সব সংস্কৃতিই উৎস, বিকাশ, মূল্যবোধ এবং সংগঠনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তাই বাহ্যিক রূপরেখা, তার বিবিধ প্রকাশ এবং নির্যাসে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট পৃথক। হাজার হাজার বছর ধরে নানা নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শাখা-গোষ্ঠী, নানা শ্রেণির মিলন, পারস্পরিক প্রভাব এবং সমন্বয়ের ফলে

গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি। বহু শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির বিভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী উপাদানের সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে বঙ্গীয় অঞ্চলে বাঙালিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে যাকে বলা যায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং এক কথায় বলা যায় বঙ্গদেশ ও বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি (সিরাজুল ইসলাম, ২০০৩ : ১৯১)।

বাঙালি সংস্কৃতি মূলত সমন্বয়বাদী। এটি কোনো অখণ্ড অথবা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। এ সমাজ যেমন বহু ভাগে বিভক্ত, এ সংস্কৃতি তেমনি বহু রঙে রাঙানো। বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু, মুসলমান, উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, আশরাফ, আতরাফ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান– সবার সংস্কৃতি। শহরের, গ্রামের, ধনীর, গরিবের– তাবৎ মানুষের সংস্কৃতি। এবং সে কারণে এ সংস্কৃতির অবয়ব আদৌ শাদামাটা অথবা একমাত্রিক নয় (গোলাম মুরশিদ, ২০০৬ : ১৪-১৫)। প্রকৃতই বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত বর্ণিল, বিচিত্র এবং একইসঙ্গে স্বকীয়তাসম্পন্ন। এই স্বকীয়তা বা নিজস্বতা প্রতিটি সংস্কৃতির শক্তি।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে সাধারণত অপসংস্কৃতির ভয়ানক অনুপ্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইংরেজি 'Aggression' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো আগ্রাসন। একটি দেশের একক সংস্কৃতি যখন অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং অন্য সংস্কৃতির স্থান যখন সেই সংস্কৃতি নিয়ে নেয় তখন তাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলে (*দৈনিক যায়যায়দিন*, ২৪.১১.২০১৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' নামেও পরিচিত। নয়া উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিভিন্ন দিকের অন্যতম হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যখন একের পর এক সাবেক উপনিবেশসমূহ স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে, তখন নয়া উপনিবেশবাদীরা তাদের প্রভাব ও বাজার বজায় রাখার অন্যতম কৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন-এর নীতি গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনবাদীরা মনে করে যে, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করলে সে জাতির প্রতিরোধক্ষমতাও নষ্ট হতে বাধ্য (হারুনুর রশীদ, ২০১৩ : ৫৫)। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটনই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য। জ্যান নেডারভিন মনে করেন :

> বিশ্বায়ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সংকর সংস্কৃতি (Hybrid Culture) সৃষ্টি করবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় সংস্কৃতি'। এ নয়া সংস্কৃতি এখন স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৪০)

বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের যে সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে সেগুলো হলো :

ভাষা

ভাষা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং কথা বলা হচ্ছে একটি সাংস্কৃতিক চর্চা। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিশ্বায়ন পর্বে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা আজ প্রবল হুমকির সম্মুখীন। আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বমানব হওয়ার দুর্মর বাসনায় বরাবরের মতোই বাংলার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী

সময়ে এ ভাষার প্রচার ও প্রসারে যে অমিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা আজ তিরোহিত তো হয়েছেই, বরং এ ভাষার বিগত সময়ে যতটুকু প্রসার হয়েছিলো তাও যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে (মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন, ২০১২ : ১৩০-১৩১)। আপন ভাষাকে ভুলতে পারলে বাঙালি যেন মুক্তি পায়। ইংরেজি তার জীবিকার নিশ্চয়তা। সেজন্য সে আপন ট্যাক উজাড় করে ভিন্ন দেশ থেকে লাখ টাকা মূল্যের ইংরেজির পণ্ডিত আমদানি করে জেলায় জেলায় আপন সন্তানদের ইংরেজি শেখানোর কাজে নিয়োগ করছে, ব্রিটিশের জমানাতেও যার প্রয়োজন পড়ে নাই। বাঙালি বছরে দু'বার বাংলা চর্চা করে বটে– একবার, ফেব্রুয়ারি মাসে, আরেকবার বাংলা সনের প্রথম দিনে। বাঙালি বছরে দুইবার বাঙালি হয়, বাঙালি হওয়ার উৎসব বসায়, বছরের আর সময় সে অবাঙালি হয়ে যায় (শামসুজ্জামান খান, ২০০৮ : ৯৩-৯৪)। আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে মানুষ নিজেকে স্মার্ট করার জন্য ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফরাসি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বের ৩৫০ কোটি লোকের ভাষা হবে ইংরেজি, ২০০ কোটি লোকের ভাষা হবে মান্দারিন এবং ১০০ কোটি লোকের ভাষা হবে হিন্দি (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। এখন আর বাঙালিদের চিরপরিচিত বাবা-মা শব্দটি খুব একটা শোনা যায় না। বাবা-মা সম্বোধনের স্থলে এখন ছেলেমেয়েরা পাপা-মম বলে সম্বোধন করে। আর পিতামাতারা সেই সম্বোধন শুনে অনেক বেশি আত্মতৃপ্তি লাভ করে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। বিশ্বায়নের ফলে বর্তমানে অনেকে বাংলা ভাষার পরিবর্তে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিদেশি ভাষা ব্যবহার করছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রতিটি জাতির নির্ধারিত লেবাস-পোশাক তার সভ্যতা-সংস্কৃতির দর্পণ। পোশাক দ্বারাই জাতির ইতিহাস উন্মোচিত হয় এবং তার আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা যায়। এটিই কৃষ্টির প্রাণ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান অর্জিত হয়ে থাকে সে স্থান পোশাকেরও অর্জিত হয়। এ কারণেই ভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় কম-বেশী পোশাকের মধ্যেও তা পাওয়া যায়। পোশাকই মূলত কোন জাতির সবচেয়ে বড় পরিচয় (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২১০-২১১)। পোশাক নির্ভর করে প্রধানত দেশের আবহাওয়া এবং সংস্কৃতির ওপর। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গেও এর যোগ থাকে। ভিন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগের ফলেও পোশাকে পরিবর্তন আসে। সর্বোপরি, এর যোগাযোগ থাকে প্রযুক্তি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে (গোলাম মুরশিদ, ২০০৬ : ৪৬১)। বিশ্বায়ন পোশাক পরিচ্ছদে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গামছা, লুঙ্গি, কোর্তা-ফতুয়া, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শাড়ি-ব্লাউজ বাংলাদেশি নরনারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে এখন আর কেউ ঐসব পোশাক পরতে চায় না। পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে এখন বাংলাদেশি নারীরা সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ছেড়ে জিন্স, টি-শার্ট, স্কার্ট ও শর্ট ফতুয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পুরুষের লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি, জিন্স, গ্যাবাডিন, কোর্ট, টাই দখল করেছে। ফলে শালীন ও রুচিবোধসম্পন্ন বাংলাদেশি নারী-পুরুষরা ক্রমেই অশালীন ও রুচিবোধহীন হয়ে পড়ছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩ ও ৩৪৯)। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুকরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যাভ্যাস

অনুপ্রবেশকৃত সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে বিচিত্র খাদ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত হচ্ছে। এর কোনো কোনোটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হলেও অধিকাংশ খাবার এদেশীয় আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষদের অনুপযোগী ও স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর। আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে এই খাবারগুলো নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উৎকর্ষের অন্যতম মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। হালে এসব খাবার ফাস্ট ফুড নামেই পরিচিত। হট ডগ, হ্যামবার্গার ও পিৎজা লোকদের প্রিয় খাবারে পরিণত হয়েছে। মার্কিন কালচারের প্রতিনিধিত্বকারী ম্যাকডোনাল্ড, বার্গার কিং ও পিজাহাট নামক রেস্টুরেন্ট প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি শহরে খুলে গেছে। এ সমস্ত রেস্টুরেন্টে লোকদের উপচে পড়া ভীড় থাকে (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২১২)। ফাস্ট ফুড পাশ্চাত্যদের প্রধান খাবার কারণ তাদের পরিবারে খাবার তৈরির রেওয়াজ নিতান্তই কম। কিন্তু আমরা ফাস্ট ফুড খাই কেন? কোকাকোলা থেকে শুরু করে সিগারেট সামগ্রী নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক সেবার অন্তর্গত বিষয়। বিশ্বায়ন নিঃসন্দেহে ভোগবাদকে বাড়িয়েছে (মোঃ আকবর হোসেন, ২০০৯ : ১৪)। 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বাংলাদেশি মানুষদের অতি পরিচিত একটি বিশেষণ। তিনবেলা মাছ-ভাত খেতেই তারা অভ্যস্ত। অতিথি আপ্যায়নেও তারা মাছ-ভাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সাথে থাকে বিভিন্ন রকম পিঠা-পুলি, ফিরনি-পায়েস ও গুড়-মুড়ি। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশিদের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমেই তারা ফাস্ট ফুডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অতিথি আপ্যায়নে এখন তারা নুডুলস, চিপস পরিবেশন করছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। এর ফলে বাঙালিদের ঐতিহ্যবাহী খাবার-এর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে।

পরিবার ব্যবস্থা

পরিবার হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে বসবাস করে। পরিবারের দুটি প্রধান রূপ হলো যৌথ পরিবার এবং একক পরিবার। চীন এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারগুলি নানা কারণে ভেঙে যাচ্ছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব, আর্থিক সমস্যা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। একক পরিবারে একটি দম্পতির সন্তানসন্ততি ছাড়া সাধারণত আর কেউ সেখানে বসবাস করে না। যৌথ পরিবারে অবশ্য দু-তিন পুরুষের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন বর্তমান থাকে। আধুনিক একক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল বলে মর্গান তাঁর '*Ancient Society*'- তে উল্লেখ করেছেন (আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০১৬ : ১১৬)। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে চিরপরিচিত যৌথ পরিবার প্রথার পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মানুষ তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একক পরিবার গঠনে অধিকতর উৎসাহী। তাই বর্তমানে আমাদের সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার বিকশিত হচ্ছে। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ ফিকে হতে শুরু করেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৪৯)। বিশ্বায়ন যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে যায়।

সংগীত

দেশীয় সংস্কৃতিতে অন্য একটি বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সুর সম্ভার হারিয়ে যাচ্ছে বিজাতীয় সংগীতের প্রভাবে। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মানুষ কেবলই মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা ও শাকিরাদের পশ্চিমা পপ সংগীতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ব্যান্ড সংগীতের নামে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা যে হৈহুল্লোর-চেঁচামেচির মহড়া দেয় তা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে না মোটেও (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৩৮ ও ৩৪৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের প্রতি মানুষের আর তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গাজীর গান ও গম্ভীরা প্রভৃতির স্থান দখল করেছে পশ্চিমা পপ সংগীত। একতারা, দোতারা, সারিন্দা, ঢোল-তবলা ও বাঁশি এখন আর আগের মতো সুর তোলে না। সেগুলোর স্থান দখল করেছে গিটার, কি-বোর্ড, বেহালা, পিয়ানো, পাইপ অর্গান ও সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

চলচ্চিত্র

দৃশ্য ও শব্দ এই দুই ইমেজের সমন্বয়েই তৈরি হয় চলচ্চিত্রের ভাষা ও নন্দনভাবনা। বিশ্বায়নের ফলে সিনেমাটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে দর্শকদের কাছে। চলচ্চিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ। যে সংস্কৃতিতে তা নির্মিত হয় তাকেই প্রতিনিধিত্ব করে চলচ্চিত্রটি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে তার একটি বড়ো অংশ হলিউডের অনুকরণ। এসব ছবিতে আমেরিকার জীবনধারা তুলে ধরা হয় এবং তাকে আদর্শ হিসেবে দেখার তাগিদ থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতিকে দেখানো হয় সমাজের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে। এমনকি অন্যান্য দেশের লোকগাথাকে বিকৃত করতে হলিউড দ্বিধা করে না। যেমন ডিজনি মুভি মুলান-১৯৯৮ (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯.০৫.২০১৮)। বিশ্বায়নের ফলে বাংলা চলচ্চিত্রগুলো এদের স্বকীয়তা হারিয়েছে। এখন বাংলা চলচ্চিত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পশ্চিমা যৌনতানির্ভর কাহিনী সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্রে এখন স্বল্পবসনা নারীদের পদচারণা খুব বেশি। শিল্পের ছোঁয়া নেই এসব অভিনয়ে। ফলে এখন ইচ্ছা থাকলেও কেউ সপরিবারে সিনেমা হলে যেতে পারে না (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ২৩৮ ও ৩৪৯)। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে বাংলা চলচ্চিত্র তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

উৎসব

মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো উৎসব। উৎসব মানুষকে আনন্দ দেয় এবং মানবাত্মাকে প্রসারিত করে। বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি। বাংলায় প্রচলিত লোকায়ত উৎসবের মধ্যে রয়েছে– পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষা উৎসব, শরৎ উৎসব, নবান্ন উৎসব, বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, পৌষ-পার্বণ, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি। বিশ্বায়নের ফলে এসব সার্বজনীন উৎসব সমূহের বিলুপ্তির প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন বাংলাদেশিরা থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইন্স ডে ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতি পালনে অনেক বেশি তৎপর (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৫০)। বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং আকাশ সংস্কৃতির অবিরাম

বিকিরণ পৃথিবীর শত শত ঐতিহ্যবাহী দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে (শামসুজ্জামান খান, ২০০৮ : ১৩২)। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পালন করতে গিয়ে বর্তমানে দেশীয় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পালন অনেকটা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

খেলাধুলা

মানবসত্তার স্বাভাবিক গতি ও ধারা বহমান রাখতে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের প্রাণ জীবন্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস এখন বিশ্বের সর্বত্র চলছে। জার্মানির গুটেনবার্গে টাইপরাইটার আবিষ্কার যেমন রেনেসাঁ ঘটিয়েছে তেমনি বিশ্বায়ন খেলাধুলার বিশ্বে রেনেসাঁ ঘটিয়েছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম বর্তমানে কাবাডি, গোল্লাছুট, কুতকুত, কানামাছি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলার পরিবর্তে কম্পিউটার ও মোবাইলে বিভিন্ন পাজ্‌ল ও ভিডিও গেম নিয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে।

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট আকার ধারণ করছে। এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী ভোগবাদী সমাজের প্রলোভনের বিভিন্ন উপকরণ। বর্তমান প্রজন্মের এক বিশাল অংশ সার্বিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সহজ মেলামেশার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে নারী-পুরুষের মধ্যে। নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়ছে। সিনেমার চটুল কাহিনিতে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল নৃত্য-গীত, নায়ক-নায়িকার উদ্দাম প্রণয়চিত্র, খুন-জখম, রাহাজানি-ছিনতাই ও ডাকাতি ইত্যাদি যুবসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাদের নিজ নিজ সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধকে হারিয়ে ক্রমেই পশ্চিমা ধ্যানধারণানির্ভর সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে যৌনতা ও হিংস্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজি নতুন বর্ষ পালনে কিংবা ১৪ ফেব্রুয়ারি পালনে হিড়িক লেগেছে। প্রেম-ভালোবাসা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার থেকে দেহসর্বস্বে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের দিন দিন অবনতি ঘটছে। গুরুজন ভক্তি নতুন প্রজন্মের কাছে বিকৃত রূপধারণ করেছে (শওকত আরা হোসাইন, ২০১৯ : ৩৩৩)। বিশ্বায়ন চায় নৈতিকতার পতন ও অবক্ষয়ের এই যুগে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীতি-নৈতিকতাহীন জাতির অপবিত্র নীতি-নৈতিকতা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে এবং জাতি যেন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি সৎ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, বরং জাতি যেন কোন সমাজ বিনির্মাণের কষ্ট করতেও প্রস্তুত না হয়। কারণ তার সমাজ হবে পশ্চিমা দেশে বিনির্মিত "ইম্পোর্টেড" সমাজ (ইয়াসির নাদীম, ২০০৮ : ২৫৪)। একটি আদর্শ সমাজ গঠনে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা দুষ্কর।

সুপারিশমালা

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করতে পারে :

১. বিশ্বায়নের ফলে বাংলার সাথে বিশেষত হিন্দি ও ইংরেজির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক ধরণের অদ্ভূত ভাষায় কথা বলে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। এর ফলে বাংলা ভাষার বিকৃতি দিন দিন বাড়ছে। তাই সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সঠিক রূপের প্রচলন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিদেশিদের অন্ধ অনুকরণ করছে। ফলে বর্তমানে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ঐতিহ্যের সংকট। এই সংকট থেকে উত্তরণের নিমিত্তে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. ফাস্ট ফুডের সহজলভ্যতা ও জনপ্রিয়তার কারণে দেশীয় পিঠা-পুলি, ফিরনি-পায়েস এবং গুড়-মুড়ি নবীন প্রজন্ম এখন আর পছন্দ করে না। এজন্য দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবার গ্রহণে আমাদের নবীন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৪. আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবার বিকশিত হচ্ছে। পরিবার ব্যবস্থার এ ধরণের ভাঙন রোধকল্পে যৌথ পরিবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে হবে।

৫. আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পশ্চিমা পপ সংগীত অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি ও ভাওয়াইয়া প্রভৃতির স্থান দখল করেছে পশ্চিমা পপ সংগীত। সংগীতের ক্ষেত্রে এ বিপর্যয় রোধে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য ভাষার চলচ্চিত্রকে অন্ধ অনুকরণ করছে। এর ফলে বাংলা চলচ্চিত্র স্বকীয়তা ধরে রাখতে পারছে না। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনি ও গল্প নির্মাণে নতুনত্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং একই সাথে স্বকীয়তা ধরে রাখতে হবে।

৭. বর্তমানে বাংলাদেশিরা থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেনটাইন্স ডে প্রভৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতি পালনে অনেক বেশি তৎপর। ফলে বাংলায় প্রচলিত লোকায়িত উৎসবের প্রতি তাদের আগ্রহ দিন দিন কমছে। সুতরাং, আমাদের চিরাচরিত লোক উৎসবের প্রতি সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. বিশ্বায়নের বদৌলতে আমাদের নতুন প্রজন্ম ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার সুযোগে কম্পিউটার ও মোবাইলে বিভিন্ন পাজল ও ভিডিও গেম নিয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে থাকে। এর ফলে অনেকেই ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে পড়ছে। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি উৎসাহও প্রদান করতে হবে।

৯. বর্তমান প্রজন্মের এক বিশাল অংশের মধ্যে দেখা দিয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতির চর্চা এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতি-নীতি মেনে চলার ব্যাপারে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানাবিহীন বিশ্ব। বিশ্বায়ন যেমন মানুষের পরিচিতিকে করেছে সংকটময়, তেমনি করেছে অনিশ্চয়তাবাদী, সংশয়বাদী এবং খণ্ডিত। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলোতে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। 'বিশ্বায়ন' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি বিষয়ে ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক অর্থ বহন করে। সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একারণেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপজ্জনক দিকটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি 'আধিপত্যের মতাদর্শ' (Ideology of dominance) থেকে উদ্ভূত। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ভাষা সবকিছু আজ প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়। বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, পরিবার ব্যবস্থা, সংগীত, চলচ্চিত্র, উৎসব ও খেলাধুলায় দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি আজ বিপন্নতার সম্মুখীন। আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বায়ন এক অনিবার্য বাস্তবতা। বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সুচিন্তিত ও সুদৃঢ় পদক্ষেপই পারে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নামক এই ভয়ানক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে।

সহায়কপঞ্জি

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য (২০১৬)। *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*। অনন্যা, ঢাকা।

ইয়াসির নাদীম (২০০৮)। *বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি*। প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০০৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর, ঢাকা।

প্রাণগোবিন্দ দাশ (২০১৩)। *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০২)। *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*। হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।

মোঃ আকবর হোসেন (২০০৯)। *বিশ্বায়ন ও উত্তর আধুনিকতাবাদ*। গ্রন্থ কুটির, ঢাকা ।

মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন *সম্পা.* (২০১২)। *বিশ্বায়ন : সংকট ও সম্ভাবনা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মোঃ আমীর হোসেন মিয়া ও এ. কে. এম শওকত আলী খান (২০১৭)। *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*। গ্রন্থ কুটির, ঢাকা।

রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ (২০০৫)। *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী (২০১৫)। *সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*। মিত্রম্, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান *সম্পা.* (২০০৮)। *বাংলাদেশ সংস্কৃতির সন্ধানে*। সূচীপত্র, ঢাকা।

শাহ মোঃ আব্দুল হাই (২০১৮)। *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি*। বিদ্যাধন প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত আরা হোসাইন *সম্পা.* (২০১৯)। *বিশ্বায়ন, আঞ্চলিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান*। আকাশ বুক ডিপো, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম *সম্পা.* (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৯*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী (২০১৩)। *বিশ্বায়ন বিস্তার ও বিরোধ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হারুনুর রশীদ (২০১৩)। *রাজনীতিকোষ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বাংলাদেশ স্টাডিজ, ইউনিট-১৩। "বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের সমাজ"। বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৯.০৫.২০১৮

দৈনিক যায়যায়দিন, ২৪.১১.২০১৯